কৃত্রিম বনাম প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা

— গৌতমকুমার পাল
(মাধ্যমিক, ১৯৯৫)

ছোটোবেলায় টিভি-তে একটা সিরিজ হতো — ''জনি সোকো এন্ড হিজ ফ্লাইং রোবোট।'' সেটা দেখতে দেখতে ভাবতাম যে বড় হয়ে এরকম একটা রোবট বানাবো — সে বন্ধুর মতো সব সময় আমার পাশে থাকবে, সঙ্গ দেবে।

স্কুলজীবনের শেষ পর্যায়ে, ১৯৯৭ সালে, একটা খবর শুনে চমকে উঠলাম — যে আই বি এম-এর সুপার কম্পিউটার ''ডীপ ব্লু'' দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গ্র্যান্ডমাস্টার গ্যারি কাস্পারভ-কে পরাস্ত করেছে। যন্ত্রের প্রতি আমার আস্থা বাড়ল, আর মানুষের প্রতি কমলো। বুঝলাম, দাবার মতো খেলায় মানুষ যেমন প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিজের পর পর কয়েকটিমাত্র সম্ভাব্য চাল বিচার করতে পারে, কম্পিউটারের গণনাশক্তিতে তার থেকেও অনেকগুণ বেশী সম্ভাব্য চাল ও পাল্টা চালের ক্রম (সিকোয়েন্স) বিচার করা সম্ভব।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় জানতে পারলাম যে রোবোট বানানোর কায়দা বুঝতে গেলে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উচ্চতর পড়াশুনো করতে হবে। স্টিভেন স্পিলবার্গের সাই-ফাই সিনেমা এ. আই. (২০০১) দেখার পর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম যে একদিন এমন রোবট বানানো সম্ভব হবে যার কিনা মানুষের মতো মন, অনুভূতি, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা থাকবে।

এরপর যতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলাম, স্বপ্নের প্রগাঢ়তা ততো বাড়তেই থাকলো। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করলাম। অচিনপুরের দরজা খুলে গেল চোখের সামনে।

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলতে আগে বোঝাতো এক্সপার্ট সিস্টেম বা বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থা। অর্থাৎ, বিষয় অনুযায়ী (যেমন, ডাক্তারিবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা প্রভৃতি) বিশেষভাবে বানানো কম্পিউটার। এতে বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান বা ডোমেন নলেজ আহরণ করা হয় সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। তারপর প্রোগ্রামিং করে সেই জ্ঞান কম্পিউটারের মধ্যে এনকোড করা হয়।

বর্তমানে অবশ্য এক্সপার্ট সিস্টেমের পরিবর্তে মেশিন লার্নিং সিস্টেম বা শিক্ষিত যন্ত্রের প্রয়োগ অনেক ব্যাপক আকার নিয়েছে। মানুষ যেমন অনেক উদাহরণ থেকে নিজের অজান্তেই একটা সাধারণ মডেল বানায় মাথার ভিতরে, যার মধ্যে ভবিষ্যতের অজানা জিনিস শনাক্ত করার ক্ষমতা থাকে, সেরকমই কম্পিউটারের মধ্যে অনেক বাস্তব তথ্য বা ফিল্ড ডাটা থেকে একটি গাণিতিক মডেল বানানো হয়। অর্থাৎ মানুষ ছোট থেকে যেভাবে শিক্ষা লাভ করে একটা ধারণা তৈরি করে, সেইরকমই প্রক্রিয়ায় মেশিন নিজে লার্ন করে, তাই বিষয়টার নাম মেশিন লার্নিং।

এর মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের মেশিন লার্নিং পদ্ধতি হোল আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক। মানুষের মস্তিষ্কের নিউরনগুলো পরস্পরের সঙ্গে সিগন্যাল আদান-প্রদান করে সম্মিলিত ভাবে অনেক জটিল গণনাকার্য সম্পন্ন করে, যে গণনা গাড়ীবহুল রাস্তা পার হতেও কাজে লাগতে পারে, আবার

বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ভেদ করে ফুটবলে শট নিতেও সাহায্য করতে পারে। অনুরূপভাবে কৃত্রিম স্নায়ুজালিকা অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক ইনপুট সিগন্যালকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে গণনার খেলা খেলতে খেলতে আউটপুট সিগন্যাল তৈরি করে।

এহেন মেশিন লার্নিং-এর প্রয়োগ এখন জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। হাতের লেখা শনাক্তকরণ, আবহাওয়ায় পূর্বাভাস, ব্যাংক কাস্টমারের লোনের ফেরতযোগ্যতা বিচার, চালকহীন গাড়ী চালানো, টিউমার বিনাইন নাকি ম্যালিগন্যান্ট তা বিচার করা — কীসে নেই মেশিন লার্নিং! এগুলোর অনেক বিষয়েই মানুষের থেকে যন্ত্রের সাফল্যের হার অনেক বেশী।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এরূপ আস্ফালনের ফলে অনেকেই ভাবতে শুরু করলেন যে যন্ত্রের বুদ্ধি এক সময় মানুষকেও ছাপিয়ে যাবে। বুদ্ধি থেকে সেই জয় হয়তো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে যন্ত্রের বিচারক্ষমতা, চিন্তা, ভাবনা, বোধশক্তি এবং অনুভূতির যুদ্ধেও। কিন্তু সত্যিই কী তা সম্ভব?

চেতনা বা কনশাসনেস সম্পর্কে গবেষণা করে এখন বুঝতে পারি যে কম্পিউটার বা রোবটকে আমরা যতই বুদ্ধিমান করে তুলি না কেন, তাদের মানুষের মতো চেতনা-সম্পন্ন করে তোলা কখনই সম্ভব হবে না। মন ও বুদ্ধির অনেকটাই গাণিতিক মডেল-এ ধরা যায়, কিন্তু মন ও বুদ্ধির উপরে যে আত্মচেতনা, যে উপলব্ধি-সঞ্জাত বিমূর্ত অভিজ্ঞতা, তার কোনও জাগতিক বা গাণিতিক রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। এবং এটা সম্ভব হয় না আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে নয়, বরং গণিতেরই সীমাবদ্ধতার কারণে। এবং মজার ব্যাপার হল যে গণিতের এই সীমাবদ্ধতা গণিত দিয়েই অংশত প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে এই গাণিতিক বিশ্লেষণ বোঝানো সম্ভব নয়, তা নিয়ে না হয় সম্পূর্ণ আলোচনা তোলা থাক অন্যদিনের জন্য।

উপসংহারে বলা যায়, চেতনাই জড় থেকে জীবকে আলাদা করে, যন্ত্রমানব থেকে মানবকে আলাদা করে। আবার জীবজগতের মধ্যেও এই চেতনার মাত্রার তারতম্য আছে। আমাদের দৃশ্যমান জগতে মানুষের মধ্যে এই চেতনাশক্তি সবচেয়ে বেশী। এই চেতনাশক্তি, এই আত্মোপলব্ধি মানুষকে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা প্রদান করে, ভালো-মন্দের বোধ নিয়ে আসে, সুবুদ্ধি আর দুর্বুদ্ধির পার্থক্য করতে শেখায়, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে — দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসার মতো সূক্ষ্ম অনুভূতি বুঝতে, ভাবতে ও তদনুসারে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এরূপ বোধ, ভাবনা ও কাজ অনেক সময়ই সীমিত গণিতের বিচারে দুর্বলতা, পরাজয় ও বুদ্ধিহীনতা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে এবং অনেক সময়ই যন্ত্র এই বিচারে মানুষের থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমান ও সফল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য এই যান্ত্রিক বুদ্ধির দাম থাকলেও, জগতের আনন্দযজ্ঞে মহাকালের মহানৃত্যের ছন্দে সেই বুদ্ধির গুরুত্ব বুদ্বুদের মতোই ক্ষণস্থায়ী এবং নিরর্থক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আপাত জয়ের অন্তরালে সনাতন মানবিকতার চিরন্তন বিজয়গাথা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ও থাকবে।

লেখক বর্তমানে ভারতীয় সংখ্যা তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান তথা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের সঙ্কেতলিপিবিদ্যা বা ক্রিপ্টোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।